যুগান্তর

মিঠে কড়া সংলাপ

ভিসি ও প্রভোস্ট দায় এড়াতে পারেন না

প্রকাশ : ১৯ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন

মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন। ফাইল ছবি

গত বছর এক সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ক্যাম্পাসে গেলে সেখানকার কলাভবন ও মধুর ক্যান্টিন এলাকায় প্রায় শ'তিনেক মোটরসাইকেল দেখে বেশ খানিকটা চমকে উঠেছিলাম। অতঃপর ফেরার পথে দেখলাম মোটরসাইকেলের সংখ্যা আরও কিছুটা বেড়েছে।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পথচলা একজন ছাত্রকে এসব যন্ত্রযানের মালিকানা বিষয়ে প্রশ্ন করায় ছাত্রটি যে জবাব দিলেন, তা-ও কম চমকপ্রদ নয়। ছাত্রটি

জানালেন, ‘আঙ্কেল, এসব মোটরসাইকেলের মালিকরা প্রায় সবাই ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। আর বিভিন্ন হলের ছাত্রনেতারা প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যারাতেই এখানে আড্ডা দিতে আসেন; তাছাড়া আশপাশের ভার্সিটি ও কলেজের কিছু ছাত্রনেতাও এখানে এসে জড়ো হন।

’ বললাম, ‘বেশ ভালো তো, আমি কিন্তু জীবনে এতগুলো মোটরসাইকেল একত্রে রাখা অবস্থায় কোথাও দেখি নাই।’ এই বলে ফিরে আসার পথে ভাবলাম, আমাদের দেশ তো আসলেই অনেক উন্নতি লাভ করেছে। ছাত্রসমাজের হাতে এত বেশিসংখ্যক যন্ত্রযান উন্নতির লক্ষণই বটে।

কিন্তু পাশাপাশি যখন ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির দৃশ্য মনে পড়ল, জার্মানির শিক্ষানগরী হাইডেলবার্গ সিটির বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্য মানসপটে ভেসে উঠল, তখন মনটা কেমন যেন ফিকে হয়ে গেল। কারণ আমি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় সেখানকার সাইকেলস্ট্যান্ডগুলোতে হাজার হাজার বাইসাইকেল দেখে এসেছি।

আবার কিছুদিন আগে হাইডেলবার্গ সিটি ভ্রমণের সময়ও সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের সাইকেলস্ট্যান্ডে হাজার হাজার বাইসাইকেল দেখে অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে জেনেছিলাম, ছাত্ররাই বাইসাইকেলগুলোর মালিক। তবে কিছু শিক্ষকও বাইসাইকেল চেপে আসেন। অর্থাৎ ছাত্ররা তো বাইসাইকেল চেপে ক্লাসে যাতায়াত করেনই, অনেক শিক্ষকও বাইসাইকেল চেপে ক্লাস নিতে আসেন।

এ অবস্থায় আমার মনের মধ্যে ভীষণ একটা কিন্তুর উদয় হল। মনে হল, ‘ডাল মে কুচ কালা হ্যায়’। এসব ছাত্রনেতার পরিবার তাদের সবাইকে মোটরসাইকেল কিনে দিয়েছে, এ বিশ্বাস আমার মন থেকে মুহূর্তে উবে গেল। পরে অবশ্য এ বিষয়ে জানার চেষ্টা করে কিছুটা যা জানতে বা বুঝতে পেরেছিলাম তা হল, ছাত্রনেতারাও আজকাল টাকা রোজগারের ফন্দি-ফিকির শিখে ফেলেছেন।

অনেকেই অনেক সরকারি দফতরে গিয়ে তদবির বাণিজ্য করে থাকেন। এমনকি অনেকের পোস্টিং, পদোন্নতিসহ ঠিকাদারি ব্যবসার রমরমা বাণিজ্য পর্যন্ত ছাত্রনেতাদের তদবিরে হয়ে থাকে। ব্যস, ওই পর্যন্ত জেনেশুনেই আমি ‘থ’ মেরে গিয়েছিলাম। মাঝে একবার ভেবেছিলাম এসব নিয়ে কিছু একটা লিখি। কিন্তু তা না করে আমি আরও কিছু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের চেষ্টায় ছিলাম।

অতঃপর এসব বিষয়ে জানতে, শুনতে ও বুঝতে গিয়ে শুধু অবাক নয়, হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণির শিক্ষকের নৈতিক স্খলনের কথা শুনে ভেবেছিলাম- থাক, এসব নিয়ে আর নাইবা লিখলাম।

কিন্তু না, এক বছর পার হতেই আমাকে কিছুই লিখতে হল না, থলের বিড়াল এমনিতেই বেরিয়ে এলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের শত শত কোটি টাকা থেকে ভিসি ও ছাত্রনেতাদের বখরা, ভাগ-বাটোয়ারার কথা আপনাআপনি দেশের মানুষ জানতে পারলেন। ভাগ-বাটোয়ারায় গরমিল হওয়ায় নিজেরাই নিজেদের তথ্য ফাঁস করে দিলেন!

এরপর আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধেই তহবিল তছরুপের অভিযোগ উঠল, অনেক ভিসিই তাদের পদমর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে নয়ছয় করেছেন এবং করছেন বলে দেশের আমজনতা পর্যন্ত জানতে পারলেন। যে বিশ্ববিদ্যালয় দেশ ও জাতি গঠনে জাতির বিবেক হিসেবে বিবেচিত, বাতিঘর হিসেবে পরিচিত, সেসব স্থানেই এমন সব কাজ-কারবারের কথা জানতে ও শুনতে পাওয়া গেল যে, তাতে করে ওই শ্রেণির ভিসি বা শিক্ষকদের লজ্জা ঢাকাই মুশকিল হয়ে পড়ল।

এমন ঘটনাও জানা গেল, কোনো কোনো শিক্ষক শুধু প্রশ্নফাঁসের মতো ঘটনাতেই জড়িত নন, একশ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরীক্ষার সময় তাদের পছন্দের ছাত্র বা ছাত্রীদের বেশি মার্ক পর্যন্ত পাইয়ে দেন। অন্যদিকে কোনো ছাত্রছাত্রী যদি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা বিভাগীয় প্রধানের প্রিয়ভাজন না হন, তোষামোদ না করেন, তাহলে সেসব শিক্ষার্থীকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। আর এভাবে অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধেই অভিযোগ আছে যে, তারা তাদের বিভাগের অনেক ছাত্রীকে অকারণে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজ কক্ষে বসিয়ে রেখে অযাচিত গল্প-গুজব করতে বা আড্ডা মারতে বাধ্য করেন।

আর যেসব ছাত্রী এসব পছন্দ করেন না, তারা অত্যন্ত মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও তাদের ডিঙিয়ে পছন্দসই অন্য কাউকে বেশি মার্ক দিয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো ও মেধাবী ছাত্রীদের উপরে স্থান দেয়া হয়। এভাবে যে মেধাবী ছাত্রীটির প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার কথা, তাকে ডিঙিয়ে অন্য কাউকে সে স্থানটি দিয়ে মেধাবী ছাত্রীটিকে চতুর্থ বা পঞ্চম স্থানে ঠেলে দেয়ার বিষয়েও অভিযোগ আছে।

আবার অন্য একশ্রেণির শিক্ষক তো ছাত্রীদের, এমনকি সহকর্মীদের শ্লীলতাহানি করতেও দ্বিধা করেন না। আর এসব কথা এখন আর ধামাচাপা পড়ে আছে, এমনটিও নয়!

এ অবস্থায় নিঃসন্দেহে বলা চলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণির শিক্ষক নিজেদের মর্যাদা নিজেরাই ক্ষুণ্ন করেছেন এবং করছেন। আর সে অবস্থায় তারা আর শিক্ষকের মর্যাদায় নেই। শিক্ষকের মর্যাদা তারা ভূলুণ্ঠিত করেছেন।

তাছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে এসে তারা দলবাজি করে নিজেদের এমন স্তরে নিয়ে গিয়েছেন যে, তাদের দলকানা বললেও কম বলা হয়। আর এসব দলকানার হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রভোস্ট, রেক্টর, প্রক্টর ইত্যাদি পদ ছেড়ে দিয়ে সময়ে সময়ে বিভিন্ন সরকারেরই বা কী লাভ হয়েছে, সে বিষয়টিও বোধহয় ভেবে দেখার সময় এসেছে। কারণ সেদিন বুয়েটে যে ঘটনাটি ঘটে গেল সে বিষয়টি ভালোভাবে পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে, ওইসব দলকানা শিক্ষকের হাতে ভিসি, প্রভোস্ট ইত্যাদি পদ ছেড়ে দিয়ে সরকারের ভাবমূর্তি বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কয়েকদিন আগে বুয়েটে আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় স্পষ্ট প্রমাণিত হল- দলকানা শিক্ষক, প্রভোস্ট ছাত্রদের জন্য, এমনকি সরকারের জন্য কতটা ক্ষতির কারণ হতে পারে! কোনো ভিসি যখন একদল ছাত্র কর্তৃক অন্য একটি ছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা করার পরও তার লাশ দেখতে না গিয়ে, এমনকি জানাজায় অংশগ্রহণ না করে বলতে পারেন, 'এতগুলো সরকারি লোককে এত তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করানো এমনিতেই সম্ভব হয় নাই'; আবার কোনো প্রভোস্ট যখন তার হলের ছাত্রটি নিহত হওয়ার পর বলেন, 'ছাত্রটি কেন যে বাইরে গিয়েছিল, কী হয়েছিল তা এখনও জানা যায়নি', তখন সেই ভিসি ও প্রভোস্টের শিক্ষা-দীক্ষা, যোগ্যতা, মানসিকতা, মানবিকতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন ওঠে, তেমনি তারা সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য এসব বলছেন কি না সে প্রশ্নটিও এসে যায়।

কারণ একদল বিপথগামী, দুষ্কৃতকারী ছাত্র, যারা নিজেদের খুনি হিসেবে প্রমাণিত করেছেন, সেসব ছাত্রকে ভিসি সাহেব সরকারি দলের লোক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা সরকারি দল সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের সদস্য হলেও এভাবে সরাসরি সরকারি দলের লোক উল্লেখ করার পেছনে ভিসি সাহেবের কী উদ্দেশ্য আছে বা ছিল, তা তিনিই বলতে পারবেন।

আবার 'নিহত ছাত্রটি কেন বাইরে গিয়েছিল, কী হয়েছিল, তা এখনও জানা যায়নি'- এসব কথা বলার পেছনে প্রভোস্ট সাহেবের কী মতলব ছিল বা আছে সে বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তারা উভয়েই যে চরম দায়িত্বহীনতা এবং কর্তব্যকর্মের প্রতি অসততার প্রমাণ দিয়েছেন, সে কথাটি এখানে নিঃসন্দেহে উল্লেখ করা যায়। কারণ একজন ভিসির অভিভাবকত্বে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পিতামাতারা তাদের সন্তানকে বুয়েটের মতো একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠান।

আর উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা কৈশোর-উত্তীর্ণ একজন তরুণ নিশ্চয়ই খুনি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন না বা ভিসি সাহেবরাও খুনিদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করেন না। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে তবেই তারা বুয়েটে ভর্তি হয়েছিলেন। এ অবস্থায় যেসব ছাত্রকে খুনি হিসেবে প্রমাণের জন্য ভিসি সাহেব পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন, তারা খুনি বা অপরাধী হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময়ই তারা তা হয়েছেন।

আর ভিসি ও প্রভোস্ট সাহেবের নাকের ডগায়ই তা হয়েছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর তাদের পড়ালেখাসহ অবস্থান-অবস্থিতির সবকিছুই ভিসি, প্রোভিসিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রভোস্ট ইত্যাদি উচ্চপদধারী, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে থাকে।

সে অবস্থায় একজন বা একদল ছাত্রের বখে যাওয়া, নষ্ট হওয়া, হলের ভেতর অপকর্ম করা, মাদক সেবনসহ অন্য সব ধরনের অপরাধের দায়-দায়িত্ব ভিসিসহ সংশ্লিষ্ট প্রভোস্ট, হাউস টিউটর এবং অন্যান্য শিক্ষকের ওপরই বর্তায়। আর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা যে তাদের দায়িত্ব পালন করেন না বা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ, সে কথাটিই বারবার প্রমাণিত হয়ে আবরার ফাহাদ হত্যার ঘটনায় তা বিশেষায়িত হয়ে শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতার জ্বলন্ত প্রমাণ হিসেবে দেশের মানুষের কাছে বিবেচিত হয়েছে।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা ব্যর্থতার জন্য ভিসি, প্রভোস্ট, হাউস টিউটরেরও বিচার হওয়া উচিত। কারণ যারা খুন করেছেন, শুধু তাদের সরকারি দলের লোক বলে চালিয়ে দিয়ে ভিসি, প্রভোস্ট পার পেয়ে যেতে পারেন না। যেহেতু ঘটনার স্থানটি তাদের দায়িত্বের অধিভুক্ত।

মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন : কবি, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।